বিপ্রতীপ

৺

রচনা—অবিনাশ রায়

ও

আরেক জন।

প্রচ্ছদ পট—শ্রীঅন্নদা মুন্সী।

প্রকাশক—শ্রীআভাস দাশ গুপ্ত

এ সি দাশ গুপ্ত কোং

৩২-৪, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

মুদ্রণ—জুপিটার প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

মূল্য—এক টাকা চার আনা।

মহালয়া ১৩৫৮।

সূচীপত্র

মুখবন্ধ

আমরা দু'জনে কবিতার বই বের করছি একটা। আমাদের দুজনের কেউই এত বোকা নই যে ভাবব কবিতার বই বিক্রী হবে এবং তা থেকে আমাদের খরচের টাকা উঠবে। কবিযশপ্রার্থীও নই আমরা—পেটের ধান্দায় যা করতে হয় কাব্যের পক্ষে মোটেই অনুকূল নয় সেগুলো। তবে কেন ছাপাচ্ছি এ বই—একথা জিগ্যেস করতে পারেন আপনারা। সবাই।

হঠাৎ এক ভদ্রলোক ফেরৎ দিয়ে গেলেন কিছু টাকা যেটা পাবার কোনো আশাই ছিল না। কি করা যায় এ টাকা দিয়ে? আমাদের একজনের বহুদিন-ধরে-লেখা কয়েকটা কবিতা জমানো ছিল। লেখার সময়ে মনেও হয়নি ছাপবার কথা। উড়ো টাকা পেয়ে মনে হোলা—হোক ছাপানো। আরেক জনও কবিতা লিখতেন বটে; তবে তাঁর স্বভাব একটু উড়োনচণ্ডে বলে কোনো কবিতাই পাওয়া গেল না। অধিকাংশগুলোই রয়েছে তাঁর বন্ধুবান্ধবদের কবলে—রুশোর সন্তানের মত। উদ্ধার করতে গেলে লঙ্কাকাণ্ড ঘটতে পারে ভেবে তিন দিনের মধ্যে তিনি অর্ডার মাফিক যতোগুলো প্রয়োজন ততগুলো কবিতা লিখে দিলেন। রসজ্ঞ পাঠক একটু চেষ্টা করলেই এই দু' শ্রেণীর কবিতা আলাদা করতে পারবেন। তাঁদের রসবোধ পরীক্ষা করবার জন্যেই কোন্ কবিতাটা কার জানানো হল না, আর সাজিয়ে দেওয়া হল এলোমেলো করে।

সমালোচকদের মুখবন্ধ করবার জন্যে প্রথমেই একটা দরকারী কথা বলে রাখি। আমরা কবি নই, তবে কবিতা পড়ে থাকি। আমাদের মধ্যে আলোচনাও হয় এসব নিয়ে—কাজের অভাবে খই ভাজার মত আর কি। আমাদের একজন বলেন—কবিতায় আঙ্গিকটাই হচ্ছে বার আনা, বাকী চার আনা বিষয়বস্তু—আঙ্গিকের মধ্যে টেকনিক আর ফিনিশ দুইই আছে। খুব যত্ন করে কথা পছন্দ করেন তিনি;

বার বার কাটকুট করে পলকাটা হীরের মত একটী একটী কবিতা বার করেন ; যথেষ্ট প্রলোভন ও ভয় দেখিয়েও তাঁর পুরোনো কবিতার বেশী একটী কবিতাও লেখানো যায় নি তাঁকে দিয়ে। আর একজন বলেন—কবিতা লেখাটা কিছু নয়, যে কোন মুহূর্তে তুমি যা অনুভব করছ একটু পরিচ্ছন্ন ভাষায় তাকে সাজাতে পারলেই কবিতা। যে অনুভূতিই হোক্ না কেন, এখানে তার কোনো না কোনো সমজদার মিলবে এই এঁর বিশ্বাস। বিশ্বাস নেই মোটেই কোনো রকম আকাশ-ঝরা অনুপ্রেরণার অস্তিত্বে। ইনি আবার কোটেশনও লাগান—কবি কোন বিশেষ ধরণের মানুষ নয়, প্রত্যেক মানুষই একটী একটী বিশেষ ধরণের কবি।

নানান ধাঁচের কবিতা জড়ো করা হয়েছে এই ক'পাতার মধ্যে—ট্রিঙ্কার বাড়ীর কেকের মত। কারুর না কারুর রুচিতে একটা না একটা লেগে যাবেই। যাঁর কোনোকবিতাটাই ভাল লাগবে না তিনি হতভাগ্য। বাংলা দেশে হতভাগ্যের সংখ্যা কম নয় বলেই আমাদের ধারণা।

অনুবাদ রইলো দুটো—স্বাধীন ভারতের অনুবাদ বলে ক্রীতদাসের ভঙ্গী নয় তাদের। মিল-ওলা কবিতা আছে গোটা কয়, সনেটের প্যাচও দেখনো হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ছাঁচে ঢালা গদ্যকবিতার দিন এখনও আছে আমরা মনে করি বলে ঐ জাতীয় কয়েকটা কবিতাও দেওয়া হল। এগুলোকে ছোট গল্পের লিরিক সংস্করণ বললে খুব অন্যায় করা হবে কি ? আধুনিক বিদেশী কবিদের দু এক লাইনের তর্জমাও চুরি করে ঢুকিয়ে দিয়েছি কোন কোনো কবিতার মধ্যে। আমাদের কবিতার সঙ্গে এরকম একাত্ম হয়ে গেছে তারা যে পণ্ডিত পাঠকও তাদের চিনতে পারবেন না আশঙ্কা করছি। দেশী কবিও যে তালে গোলে ঢুকে যাননি এমন কথা জোর করে বলতে পারি না। তবে সেগুলো সজ্ঞানে চুরি নয়।

আর একটা কথা বলবার আছে। সমালোচকেরা বলতে পারেন—এতদিন বাদে আবার বস্তাপচা প্রেমের কবিতা কেন ? আমরা

বলব—এগুলো প্রেমের কবিতাই নয়, প্রেমের পরিহাসের কবিতা বরঞ্চ বলা যেতে পারে এদের। দৃষ্টিভঙ্গী এদের না-মূলক। প্রেমের কবিতা লিখতে পারলে আমরা খুসীই হতুম—অবশ্য কমরেড মার্কা neurotic বা biological প্রেম নয়। প্রেম কোথায় আজ? ভাবুকেরা জন্মগ্রহণ করা ছেড়েই দিয়েছে; সাধারণ লোকের কথা আমরাই ছেড়ে দিলুম; বাকী রইলেন যাঁরা ঘটনার নিস্পেষণে মরীয়া হয়ে উঠলেও তাঁরা আজ আর বেপরোয়া হতে পারেননা; বেহিসেবী হওয়া তো অসম্ভবই। প্রেম আসবে কোথা থেকে—প্রেমের মুখ ভেংচানী পর্যন্ত চলতে পারে কোন রকমে।

কায়ার অভাবে ছায়াই সই। আর প্রেমের ছায়া দেখলেই যে আঁৎকে উঠতে হবে একথা আমরা স্বীকার করি না। রুটীর দরকার প্রথমেই একথা মানি, ওটাই যে শেষ দরকার এমন কথা এখনও মানতে পারছি না। বিবর্তনে বিশ্বাস রেখে ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে আছি। আমাদের ধারণা প্রেম আর প্রয়োজনের সমন্বয় হবে মানুষের জীবনে, মানুষের মধ্যেই হবে পশু আর দেবতার আপোষ। কবিতা হবে এই সমন্বয়ের রাসায়নিক, এই আপোষরফার বার্তাবাহিকা দূতী। দুঃখের বিষয় বাংলা দেশের আধুনিক কবিতা এদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। পশুদলের পঞ্চমবাহিনীর কাজ করাই ওর বেশী মনঃপূত। সে কাজটাও যদি ভাল করে করতে পারত! হায়রে বাংলা দেশের আজকের কবিতা!!

আমাদের মনে হয় বাংলার অত্যাধুনিক কবিদের অনেকেই জীবনের অপর সব ক্ষেত্রে বঞ্চিত হয়ে ভাল কিছু করার না পেয়ে অগত্যা কবিতা লেখার পথ ধরেছেন। অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ক্ষমতা তাঁদের। সে ক্ষমতায় চলতি পথে প্রতিষ্ঠা লাভ করা অসম্ভব—একথা তাঁরা বুঝতে পেরেছেন। আর সেই জন্যেই তাঁরা বিশেষ উটকো উটকো বিষয় বস্তু, নিতান্ত অবাস্তব বাস্তব-ঘেঁসা ভাষা এবং ছন্দ, ভুলছন্দ ও ছন্দোহীনতায় কাব্য রচনা সুরু করেছেন। ঠিক এমনিটিই হয়েছিল চসারের পরে ইংরেজী সাহিত্যে। এদের এক

কণাও জমা থাকবে না ভাবী কালের ভঁাড়ারে —এবিষয়ে এঁরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। এঁদের কোনো কোনো ভঙ্গী কিন্তু আমাদের ভাল লাগে। এই ভাল লাগার স্বীকৃতি পাবেন চারটী অত্যাধুনিকে। যাঁরা professional কবি (অর্থাৎ বিশেষ প্রয়োজন ও চাহিদায় যাঁদের কবিতা লিখতেই হবে) তাঁরা নমস্য—দূর থেকেই তাঁদের নমস্কার করি, এই নমস্কার রইল কয়েকটা কবিতায়। সেগুলোর নাম করবনা, অনেকের হয়ত আবার সেগুলো পছন্দও হতে পারে কিনা !

অনেক ছোট বড় কথা বলেছি, কবিতা পড়ুন এবার।

পুঃ কতকগুলো কবিতায় মেয়েদের যা রূপ দেখানো হয়েছে অনেক মেয়ে ক্ষুণ্ণ হতে পারেন তাতে। ক্ষুণ্ণ হবার কিছু নেই, যা হয়েছে তা লিখিনি আমরা, যা হয় তাই লিখেছি। পুরুষদের ফোটাতে পারিনি ভাল করে বলে লজ্জিত হয়ে আছি, কিন্তু পুরুষরা বাস্তবিকই অস্ফুট।

এ যুগের চাঁদ

বলি কানে কানে আস্তে
এ যুগের চাঁদ কাস্তে ;
পূর্ণিমা চাঁদ
মিছে পাতা ফাঁদ
মিছে ডাকা ভালবাসতে ;
এ যুগের চাঁদ কাস্তে ।

এ যুগের চাঁদ কাস্তে—
নিশান ওড়ায়
মানুষ পোড়ায়
শ্রেণী সংগ্রামে ভাসতে ;
এ যুগের চাঁদ কাস্তে ।

এ যুগের চাঁদ কাস্তে—
সীমাহীন ক্ষুধা
গ্রাসিবে বসুধা
হবে সব পেটে ঠাসতে ;
এ যুগের চাঁদ কাস্তে ।

এ যুগের চাঁদ কাস্তে—
শুধু হৈ হৈ
অবসর কৈ ?
কি বা হবে বলে আসতে ?
এ যুগের চাঁদ কাস্তে ।

———

ত্রিভঙ্গী

ভালবাসি কি না
নিজেই জানি না ;
তোমায় বলব কি তা বলো ?
মিছে কেন কর তোমার নয়ন ছলোছলো ?
জীবনে মোর নিছক ভালবাসা
অনেক বারই করল যাওয়া আসা ;
প্রতিবারেই ভেবেছিলাম—বুঝি
এবারে মোর মনের মানুষ সত্যি পেলাম খুঁজি :
ভেবেছিলাম—বেসেছি ঠিক ভালো,
সারাজীবন থাকবে আমার এই অলোতে আলো,
প্রতিবারেই স্বপ্ন গেছে টুটে—
অতি কাছের পরিচিতি যেই উঠেছে যে ফুটে
তাইতো আজি মনে আমার হয়
জৈব এটা, দৈব কভু নয়।
আর তাইতো বলি—ছিঃ,
এমন প্রশ্ন করতে আছে কি ?

অথবা

ভালবাসি কি না ?
কি বলব ?
ভালবাসা ?
আসে,
যায়,
যায়,
আসে ;
থাকে না।
মিথ্যা বলতে পারি না যে।

অথবা

আলো জ্বলেছে
কেমন করে বলব নিভবে কিনা ওটা ?
আবারো জ্বলবে আলো—
কাল যে অসীম।

১-যদি ২-বুঝি বা

চুম্বন চাহিয়াছিনু যবে চলে আসি
হেসেছিলে অধরার বিদ্যুল্লতা হাসি,
বলেছিলে স্মিতমুখে—হয় নি সময়,
আসিব সময় হলে, কোরো নাকো ভয়।
প্রত্যহের তুচ্ছতায় সেই ক্ষুণ্ণ ক্ষণ
ডুবে গেছে বহুদিন। লয়ে ক্ষুব্ধ মন
শুধু সেই বাণীটুকু সম্বল করিয়া
তোমা হতে বহুদূরে এসেছি সরিয়া।

বর্ষণপ্লাবিত এই শ্রাবণের সাঁঝে
অন্ধকার শূণ্যঘরে ফিরে ফিরে বাজে
অপূর্ণিত প্রার্থনার অসহায় সুর
অকারণ সে বারণ—কৌতুক নিষ্ঠুর।
কিন্তু হায়, সেদিন তো চাওয়া হয় নাই,
চাহিলে কি হোতো আজি ভাবি বসে তাই।

বা

শ্রাবণ প্লাবনলুপ্ত অন্ধকার ঘরে
একা বসে সেই সব কথা মনে পড়ে,
সঙ্গীহীন মন হয় বিকাশ ব্যাকুল
কম্পমান উৎকণ্ঠায়, আগ্রহে আকুল
তোমার সঙ্গের লাগি, তাই মনে হয়
বুঝি বা বহিয়া গেল পরম সময়।

(প্রথম আট লাইন ঠিক থাকিবে, শেষ ছয় লাইন উহার সহিত জুড়িয়া দুইটী সনেট পাইতে পারেন। সেইজন্যই দুইটী নাম)

'না-বলা বাণী'

যা বলা হয় নি
তা বলা যায় না।
এই না বলার মধ্যেই লুকিয়ে থাক আমার সব কিছু বলা
দমকা হাওয়ায় নিভে গেছে মোর ভীরু দীপশিখা,
কি হবে আবার তাকে জ্বালিয়ে ?
নিবিড় অন্ধকার ঘিরে থাকুক আমায়
তোমার ঐ আকুল কেশেরই মত।
আকাশের তারার চেয়েও তুমি দূরে,
নয়নের তারার চেয়েও তুমি কাছে,
নিকট ও দূরের সেতু বাঁধা হল
তোমারই স্মৃতির সৌরভে।

অরূপ বীণা রূপের আড়ালে

জিগ্যেস করেছিলে—
তুমি সুন্দর কিনা।
অপেক্ষা করনি উত্তরের,
নিজেই বলেছিলে
তুমি ভাল নয় দেখতে ;
নাম করেছিলে
এর, ওর, তার
যারা নাকি দেখতে ভাল তোমার চেয়ে।
অবাক হয়ে গেলে
বললুম যখন—ওদের ভাল লাগেনা আমার।
আরও অনেক অনেক অবাক হতে
বলতুম যদি—
ভাল লাগে তোমাকে।
বলিনি ও কথা।
পেশাদার প্রেমকরিয়েদের মত
শোনাবে বলেই বলিনি ;
(পৃথিবীতে
কত ভাল কথাই না
বলতে পারি না আমরা,
শুধু ভাল শোনাবে না বলে)।
সেদিন যে কথা
আটকে গেল মুখে,
কবিতায় সে কথা বলতে
সঙ্কোচ নেই কোন আজ
কবিতা যে

নিজের মনের সঙ্গেই কথা বলা
কাগজকে সাক্ষী রেখে।
কিন্তু তবু
কি করে সুন্দর বলি তোমায় বলতো!
পরিশীলিত মন এ যুগের,
অজ্ঞানের কুসংস্কার,
বিচারহীনের কুসংস্কার,
ঝেড়ে ফেলে দিয়েছি আমরা,
দাসখৎ লিখে দিয়ে
আপাতজ্ঞানের
ভুল বিচারের
কুসংস্কারের পায়ে।
এস্‌থেটিক্‌সের চশমা পরে,
বিশ্লেষণের রঞ্জন রশ্মিতে আলোকিত দৃশ্যমানের দিকে
থাকি চেয়ে-
চোখে পড়েনা দেহটা;
নজরে ঠেকে যেটা
সেটা হাড়;
তার সৌন্দর্যেই আজ আমাদের উৎসব।
আর সেই জন্যেই
মুক্তকণ্ঠে 'সুন্দর' বলতে
বাধে আমাদের,
হ্যাংলামী প্রকাশ পায় যে ওতে।
(হ্যাংলামী সংস্কৃতির হানিকারক।)

* * *

* * * *

তবু
ফিরে ফিরে
চোখ যায় কেন তোমার দিকে

বিজনের শালীনতা,
আর সমাজের শোভনতা,
কেন খিন্ন হয় বারে বারে ?

কেন ব্যর্থ হয়
সচেতনের যত্নকৃত প্রচেষ্টা
অবচেতনের অকুণ্ঠ নির্লজ্জতায় ?

কবি হতুম যদি
আঁকতুম তোমার ছবি
আমার লেখায়,
রেখায় আঁকতুম
শিল্পী হতুম যদি ;
দস্যু হলে
নিতুম লুঠে।

কিন্তু কিছু নই আমি,
একেবারেই যে কিছু নই—
তাই দেখি শুধু
চেয়ে চেয়ে,
দেখি,
আর ভুলি,
আর দেখি।

তুমি যে সত্যিই সুন্দর।

?

আমার স্বপনখানি রূপ পায় কি না
তোমার স্বপন মাঝে তাহা তো জানি না :
দিনের দ্যুতির মাঝে কামনার শিখা
ম্লান থাকে ; স্বপনে বিজয় রাজটীকা
দেয় সে আমার ভালে—নিভৃত গৌরবে
সারা প্রাণ ভরে ওঠে অপূর্ব সৌরভে ;
সে সৌরভ কণামাত্র ভেসে যায় কি না
তোমার স্বপন মাঝে—তাহা তো জানি না

অয়ি মোর শুভা সখী, অয়ি দূরগতা,
কতবার ভাবিয়াছি তোমারে এ কথা
শুধাইব মুখোমুখি, কাছে যবে আসি
সে সব ভুলিয়া যাই, সব যায় ভাসি
তোমারে আকুতি মাঝে, আজি আমি তাই
দূর হতে সনেটেতে জিজ্ঞাসা পাঠাই।

———

নিরুদ্দেশ যাত্রা

তুমি যেন মোর সমান্তরাল রেখা ;
কাছাকাছি তুমি পাশাপাশি,
তবু মধ্যে নিয়ত পরিমিত ব্যবধান
জ্যামিতিক নির্দ্দেশে—
সরল সুদূর প্রসারিত পথে নহে সম্ভব দেখা,
তাই মোর অভিযান
অসীম নিরুদ্দেশে।

দিন দুপুরে রাতের স্বপ্ন

ছুটীর দিনের নির্জন দুপুর ;
হাতে কাজ ছিল না কিছু,
শুয়ে শুয়ে পড়ছিলুম
সাগর পার হ'তে সদ্য-আসা বই
শ্রেণীসম্পর্ক সম্বন্ধে।
তুমি এলে আমার ঘরে।
বসতে বললুম।
অনেক ভাল লাগত চুপচাপ বসে থাকা।...

বিংশ শতাব্দীর
স্মার্টনেসের খর রৌদ্রে
চোখে ধাঁধাঁ লেগে গেছে আমাদের,
ভাল লাগার ঠিক পথটী
দেখতে পাই না তাই,
যতই ছটফট করি
ততই গিয়ে পড়ি বিপথে।...
কথা স্থুরু করলে এটা, ওটা —
রাজনীতি, মনস্তত্ব, ব্যক্তি জীবন,
স্থযোগ বুঝে প্রশ্ন করলুম—
আমাদের আলাপ তো মাত্র ক'দিনের,
আমাদের জানা চেনায়
এ বিশেষ ধরণের রংটা লাগল
কেমন করে বল তো ?
এর জন্যে দায়ী কে ?
তুমি, না আমি ?
চুপ করে রইলে একটু,
তারপর

নিতান্ত সহজভাবেই বললে —

দুজনেই।

চমকে উঠলুম কথা শুনে।

ভেবেছিলুম বলবে—

জানি না তো !…

বুঝলুম তুমি সেই জাতের মেয়ে

যাদের বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে না লজ্জা

এড়িয়ে যেতে শেখে নি যারা

স্বচ্ছ প্রশ্নকে

ধোঁয়াশি জবাব দিয়ে।

অস্বস্তিকর নীরবতায় কাটলো কয়েক মুহূর্ত ;

সেই নীরবতা ভাঙলে তুমি,

বললে—

সহজ যা মেনে নাও না তাকে,

চঞ্চলতা কেন এত ?

শঙ্কিত হলুম মনে মনে,

বললুম—

জানি বিভ্রান্তি আনতে পারা যায়

কথার জৌলুষে ;

কিন্তু বিভ্রান্তি তো আর সমাধান নয়।

চুপ করে বসে রইলে

আরো কিছুক্ষণ,

তারপর চলে গেছ ধীরে ধীরে।

আকাশ এখনো নীল,

অনেক উঁচুতে দুটো চিল উড়ছে

১৫ই সেপ্টেম্বর (১৯৭১)

সকাল বেলা এল একখানা……রঙীন খাম
ডাক টিকিটটা তেরছা করে লাগানো
নাম লেখা শুধু "   "।
হঠাৎ এলো কার চিঠি, অপরিচিত হস্তাক্ষর?
দ্বিধা কম্পিত হাতে চিঠিটা খুললে,
দেখলে চিঠি নয়, একটা কবিতা—
'খুকু কুতুর কুতুর চায়
আর মিটির মিটির হাসে
তাকে সবাই বড্ডই ভালবাসে'।
মনে পড়ল এক বাদল সন্ধ্যার কথা,
দীর্ঘ দিন আগে একজন বলেছিল
কুড়ি বছর পরে মনে করিয়ে দেব এই কবিতার কথা:
কত হাসবে তুমি এই ছেলেমানুষী কবিতায়।
সে আজও ভোলে নি।
বিশ বছর আগেকার স্মৃতি এখনও
তার বুকে জ্বল জ্বল করছে
শুকতারার মত, ভোরের বেলার শিশির কণার মত।
তুমি খিল খিল করে হেসে উঠলে
সেই পুরাণো ছেলেমানুষীর কথা ভেবে
তারপর
কুঁচি কুঁচি করে ছিঁড়ে ফেললে সেই কবিতা
উড়িয়ে দিলে ছিন্নপত্র বাদল প্রাতের উদাস হওয়ায়।
পাশে বসে হাসছিল তোমার নূতন পাওয়া ছোট্ট খুকীটি
হঠাৎ জড়িয়ে ধরলে তাকে তোমার বুকে
ভরিয়ে দিলে তার চোখ মুখ বুক সর্বাঙ্গ অজস্র চুমায়
তারপরে তার মুখের দিকে চেয়ে
আস্তে আস্তে গুণগুণ করে গাইতে লাগলে—
খুকু কুতুর কুতুর চায়
আর মিটির মিটির হাসে
তারে সবাই বড্ডই ভালবাসে।

বাড়ী ফেরাই ভাল

অনিমন্ত্রিত কেন এলে মোর ঘরে,
জান না এখানে কুলী মজুরের ভীড় ?
ওদের গায়ের অতি-উৎকট গন্ধে
এক লহমাতে হইবে যে অস্থির।
ওদের কথার ভব্যতাহীন মাত্রা
সরমে তোমার আনন করিবে রক্ত,
ওদের তুষিয়া তোমারে তুষ্ট রাখা
বুঝেছি সে কাজ অতিশয় হবে শক্ত।
এত তাড়াতাড়ি এই ক্ষণটীরে হেথা
না আনিলে তুমি হয়ত হইত ভাল,
এনেছ যখন, বোঝাপড়া হোক্ তবে,
রক্ত আগুনে বিদায় প্রদীপ জ্বালো।

মোহ নাই মোর এ কথা বোলো না তুমি,
বোলোনা আমার মায়া নাই এক তিল
মায়া মোহ আজ সবই যে গিয়েছে মুছে,
দেখছো না দুলে উঠিয়াছে এ নিখিল ?
অবিচার আজ স্তূপীকৃত হয়ে দেখ
তোমার আমার দুয়ারে বিচার যাচে,
আমি যদি আজ ফিরাই আমার মুখ
তা হলে উহারা যাইবে কাহার কাছে ?
ঘর বাঁধিবার মধু-অবসর কোথা ?
সব হারানোর ডাক শোনো পথে পথে,
এ ডাকে আমারে বাহির হইতে হবে,
বিষযাত্রার সঙ্গিনী চাহ হতে ?……

শুভ্র তোমার কোমল চরণ দুটী
পথের ধুলাতে নোংরা হবে যে ভারী ;
মিছিমিছি কেন যাবে এত ঝঞ্ঝাটে ?
লক্ষ্মী মেয়ের মত ফিরে যাও বাড়ী ।
মোর তরে তুমি খারাপ করো না মন,
তোমার চাইতে ওরাই আমার ভাল ;
ঘরের চাইতে পথের আকাশে আমি
পেয়েছি যে ঢের বেশী হাওয়া বেশী আলো

$\sqrt{১} = \pm ১$

ওরা ঘোচাতে চায়
আমার মোহ,
তোমার থেকে বাঁচাতে চায়
ওরা আমাকে—
তোমার দোষ কীর্ত্তনে
মুখর তাই ওরা।

তোমার আকুলতা
ওদের কাছে
ছলনাময়ীর ছলনাজাল—
স্বপ্ন-কোমল ফাঁসে
নিপুণ হাতের নিস্করুণতায় তৈরী সেটা—
অমোঘ তার আকর্ষণ,
অনিস্তার তার বন্ধ।
ক্লোরোফরমের মত
ধীরে ধীরে ছেয়ে ফেলে মন,
টেনে নিয়ে যায় মৃত্যুর পথে
সেই সব হতভাগাদের
অপ্রাচুর্য্য ঘটেছে
যাদের জীবনীশক্তির।
জীবনীশক্তি অপ্রচুর আমার।
কল্যাণকামীরা
আভাসে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেয় তাই—
নিরাপদ দূরত্বের সমীচীনতা।

যে নির্ব্বোধের
বুদ্ধি আর কল্পনা মিশিয়ে যায় ক্ষণে ক্ষণে,
তার প্রতি
উচ্ছল হয়ে ওঠে ওদের করুণা,
উদ্বেল হয়ে ওঠে ওদের স্নেহ,
প্রবল হয়ে ওঠে ওদের উৎকণ্ঠা।
সাবধানতার সতর্কবাণী
উচ্চারিত হয় মুখে মুখে।
হাঁপিয়ে ওঠে আমার প্রাণ।
ক্লান্তি লাগে বড় ;
মনে হয় ছুটী নিই ;
জানিয়ে দিই তোমায় সকল কথা।
কি করে জানাই
সেইটা সুধু ভেবে পাই না।

দূরে থাক যখন তুমি
তখন তুমি সব চেয়ে কাছে আমার ;
কিন্তু
বিনিভাষার বাণী কি কাঁপন জাগায়
ইথারের আকাশে ?
কাছের তুমির জ্ঞান কি সঞ্চালিত হয়
দূরের-তুমির অন্তরে ?
জানি না।……
আর কাছে থাক যখন তুমি
তখন যে তুমি অনেক, অনেক দূরে ;
অত দূরে
ডাক পাঠাবার জোর কই আমার কণ্ঠে ?
মনেই বা কোথা সে বল ?
রয়েছি চুপচাপ।

দিনের পরে দিন যাচ্ছে কেটে।
গানে গানে ভরা জগৎ
ঝিমিয়ে অসছে ক্রমে ক্রমে,
বর্ণালীর রং হয়ে যাচ্ছে ফিকে,
তীব্র শিহরণের তীক্ষ্ণতা
প্রত্নতত্ত্বের সম্পত্তি হবার সীমান্তে

খারাপ লাগছে বড়,
মনে হচ্ছে—হারিয়ে যাচ্ছে যেন সব কিছু,
অসহায় মনে হচ্ছে নিজেকে ;
আবার মনে হচ্ছে
এই হয়তো ভাল,
এই বোধ হয় মুক্তি।

* * *

ওদেরই জয় হবে নাকি ?
হোক্ তাই।
মুক্তি দিই তোমাকে,
তুমি কি আমায় রাখবে না বেঁধে ?
বা—
তুমি কি ছুটী দেবে না আমায় ?

———

শেষের কবিতা

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক হতে
সব মেয়েই ঝকঝকে ;
সুতরাং ঝকঝকে বলে অপমান করব না তাকে ;
সে ছিল নীট্।
দূর থেকে দেখেছি তাকে
রাজনীতির সভামঞ্চে
কিম্বা নাচগানের জলসাতে।
সে থাকত কেন্দ্রমণি,
আমি থাকতুম একান্ত উপান্তে ;
চোখাচোখি হয়েছিল দূরে দূরে,
মুখোমুখি হয় নি কখনও।

হঠাৎ এলো একদিন আমার ঘরে।
আমাকে যার—পর—নেই সংকুচিত করে
বসল আমার বিছানায়,
বলল—
কেন করি এ সব বল তো ?
কেন এই বৃথা উত্তেজনা ?
এই অকারণ মনক্ষুণ্ণতা ?
ভাল করার যে বাসনা নিয়ে এগিয়েছিলুম
তাতো পারিনি করতে ;
ভাল লাগার যে কামনা ছিল পাথেয়
তাও যে প্রায় শেষ হোলো।
কি করব এবার ?

অবাক হয়ে গেলুম।
ওর জগতে
এত জ্ঞানী, এত গুনী এত শিল্পী, এত বীর থাকতে,
এ প্রশ্ন
আমার কাছে কেন?
বললুম—
ছলনা করছ না কি?
না, পরীক্ষা?
গায়ে মাখল না কথা আমার,
বলল—
ছাড়ব না কিছুতেই আজ তোমায়।
পালিয়ে বেড়াও কেন বল তো?
ভয় করিনে তোমায়,
শ্রদ্ধা করিনে তোমায়,
ঈর্ষা করি—ঘৃণা করি।
তুমি কি এত বড়—এতই বড়
আমাদের থেকে?
কোনো কিছুরই কি ঢেউ লাগে না
তোমার গায়ে?
জড়িয়ে থেকে এড়িয়ে যাবার
এই যে স্বভাব
স্বাভাবিক হতে পারে না এ কিছুতেই।
উপহাস কর কেন আমাদের
এমন করে?
বলতেই হবে এ কথা,
ছাড়ব না কিছুতেই আজ তোমায়।
দেখলুম
উত্তেজিত হয়েছে:
(নীট মেয়ের উত্তেজনা বড়ই ভয়ঙ্কর)

বললুম—
একটু অপেক্ষা কর;
কাজ আছে
বারাকপুরে যেতে হবে;
ইচ্ছে করতো আসতে পার আমার গাড়ীতে;

রাত নটা।
গান্ধী ঘাট।
গঙ্গার জল ছল ছল করছে
শ্রাবণের পূর্ণিমার আলোতে:

দূরে বাঁশীতে
কোথায় যেন কে জয়জয়ন্তীর আলাপ করছে
চুপ করে বসে আছে
গঙ্গার দিকে চেয়ে:
বললুম—
দেখো, জীবনে দুরকমের ট্রাজেডি আছে;
প্রথম—যা চাইছ তা না পাওয়া,
দ্বিতীয়—যা চাইছ তা পাওয়া।
দ্বিতীয়টাই মারাত্মক বেশী।

* * *

ওর বাড়ীর দরজায় নামিয়ে দিলুম ওকে।

বাড়ীতে ঢোকার আগে
পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে
চাইলো একবার আমার দিকে,
বলল—
দেখা হবে না আর কোনো দিন,
ভয় নেই তোমার কিছু—
বলতে বলতে বন্ধ করে দিল বাড়ীর গেট
এঞ্জিনে আমার ষ্টার্ট দেওয়াই ছিল।

খেয়াঘাটে

বেলা যে পড়ে এলো,
অনেক হোলো দেরী ;
দাঁড়িয়ে আছি ঘাটে একা—
পাশে পড়ে আছে যত ঝুড়ি আর বোঁচকা বুঁচকি—
সারা দিনের জড় করা বোঝা।
কখন আসবে জোয়ার ?
সন্ধ্যা হয়ে এলো,
আঁধার এলো ঘনিয়ে,
আর কত দেরী ?
খানিকটা পরেই ফুলে ফুলে উঠবে নদীর বুক,
দূর থেকে শুনতে পাই তার মৃদুমর্ম্মর ধ্বনি।
কোনো তারা নেই আকাশে,
চাঁদও তো উঠলো না,
মাঝিরও দেখা নেই কেন ?
নিয়ে চল, নিয়ে চল আমাকে পার করে,
কতকাল বসে আছি একান্ত একাকী নির্জ্জন অবসাদে
দিনের কাজ সবই হল সারা,
আর যে পারি না।
এবার এসো, এসো তোমার তরী বেয়ে,
অনেক হোলো দেরী।

আঁধার এলো ঘনিয়ে,
মাঝির নেই দেখা,
চেয়ে আছি দিগন্তের পানে।
শুধু শোনা যায় দূরে জলের অস্ফুট গুঞ্জন।
আজ কি রাতে উঠবে না তারা ?
আজ কি পাব না তোমার দেখা
খেয়া ঘাটের মাঝি আমার !

(অনুবাদ)

শুধুই স্বপ্ন

তিনতলার এক চিলতে ঘর—
দক্ষিণদিকে তার এক টুকরো ছাদ।
ছাদে রয়েছে কয়েকটা টব
টবেতে গোটাকয় জুঁই, বেল—
রজনীগন্ধাও বা ছুটো একটা।
ফিকে সবুজ রং করেছি ঘরের ;
বিছানা ঢেকেছি,
টেবিল ঢেকেছি,
দরজা জানালার আব্রু এনেছি
ফিকে সবুজ শান্তিনিকেতনী ছিটে।
কাপ, ডিস্, ছাইদানী, সিগারেট কেস্ ;
জলের স্থরাই, কাঁচের গ্লাস, জলঢাকা—
ফিকে সবুজের উনিশ বিশেই
তাদের বর্ণসমাবেশ ;
সাদা বিজলী বাতিতেও
সবুজের আভা লেগেছে।
সবুজের একঘেয়েমী—
বিরক্তিকর হয়ত
কিন্তু নেশা লাগে আমার।

*　　*　　*

চেয়ে আছি পথের দিকে।
আসবে তুমি।
পরণে থাকবে জ্বলন্ত-সবুজ জর্জেট
বিদ্যুতের আভা যার পাড়ে।

পায়ে থাকবে গাঢ় সবুজ মখমলের চটী
সাদা জরির হাল্কা কাজ করা।
কপালে থাকিবে সবুজ রংয়েরি টিপ—
প্রদীপ শিখার মত।

আসবে তুমি আমার ঘরে।
বসবে এসে
সবুজ খদ্দরের ঝালর দেওয়া
শ্রীনিকেতনী মোড়ায়।
প্রাণপ্রতিষ্ঠা হবে আমার ঘরের।

কিন্তু আসবে কি তুমি?
নীলস্বপ্নের দেশ পার হয়ে
পারবে কি আসতে
আমার এই সবুজ ঘরে?

সাগর-গোধূলি

রিক্তপক্ষী আকাশ, সাগর গোধূলি,
একটী নিঃসঙ্গ তারা পশ্চিম আকাশের বুক চিরে
ঝিকঝিক করছে
তোমারি স্মৃতির মত ঈষৎ অস্পষ্ট, সুদূর বিলম্বিত।
বুদ্ধি-উজ্বল চোখ দুটী, পাৎলা ঠোঁটের মৃদু হাসিটুকু
রহস্যমদির,
আর এলো চুলের কালো মায়া
আজকের এই ম্লান সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারেরই
মত।
মনে পড়ে সেই সলাজ-মধুর দিনগুলি :

যা দিয়েছ নিজেকে উজাড় করেই দিয়েছ,
যা পেয়েছি সে তো আমারই পাওয়া ;
তবে কেন মিছে ক্ষোভ আত্মবিড়ম্বনা ?
(অনুবাদ)

নির্জ্জন জেটী একেলা বসে

নিঃঝুম রাত দ্বিপ্রহর,
গঙ্গার ধার—বরানগর,
মেঘলা আকাশ তারকাহীন,
নদীর ওপারে আলোকের মালা
জোনাকীর মত রয়েছে ফুটে।
জানলার ফাঁকে দেখা যায় দূরে পাখা নেড়ে চলে
একটী হাত—
রোগীর শিয়রে বুঝি।
ভেসে আসে ক্ষীণ মড়াপোড়ানোর গন্ধ শ্মশান হতে।

মেঘলা আকাশ তারকাহীন
নিঃঝুম রাত নিশ্চেতন।
শুধু মাঝে মাঝে শোনা যায় দূরে
দাঁড়ের শব্দ—
ঝুপ ঝুপ ঝুপ।

মৃদু শিরশিরে মিষ্টি হাওয়া
নির্জ্জন জেটী একেলা বসে।

তুমি কি এখনও রয়েছ জেগে?

তিলোত্তমা

(একটী মেয়ে—
চওড়া কপাল, কুরকুরে চোখ, লম্বা চুল,
ঝকঝকে হাসি ,
গালে তার এক ছোট্ট তিল)……

ও কপাল দেখে হিংসেয় জ্বলে মরি
জোড়া চোখে জ্বলে সর্ব্বনাশের শিখা,
একরাশ চুলে মিছেই কবরী বাঁধা,
অধরের হাসি অধরা আমার চিত্রপটে।
এ কথা কখনো ভেবেছো তিলোত্তমা
তিল থেকে থাকে তালের সম্ভাবনা ?
কে জানে কখন কোন্ সে ভাদ্রমাসে
ধুপ করে শেষে পড়িবে তোমারই পিঠে,
এ কথা কখনো ভেবেছো তিলোত্তমা ?

———

প্রমীলা গাঙ্গুলী

প্রমীলা গাঙ্গুলী এম্ এ পাশ করল।
বাড়ীতে উৎসব হোলো না বটে,
তবে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলো সবাই—
মেয়ের পড়ার টাকা
জোগাতে হবে না আর।
মফস্বলের কোনো একটা সহরে
মেয়েদের যারা চরায়
তাদের চরাবার ভার পেল প্রমীলা।
কাজ কম,
অবসর প্রচুর—
আর সেটাই হোলো প্রমীলার কাল।
(হায় রে,
স্কুলের ছঘণ্টাই যদি ক্লাস থাকত,
আর জেগে থাকার সব সময়েই
যদি স্কুল হত—
ভাবনাগুলো বড়ই দুঃশাসন যে!)।

কিছুদিনের মধ্যেই খারাপ লাগতে লাগল প্রমীলার।
কালো ছাগলছানাটা
যখন স্কুলেরমাঠে
একমনে ঘাস খায়—
তখন অবশ্য ভাল লাগে;
আর ভাল লাগে
রহিম শেখের মোরগের

বলিষ্ঠ কোঁকর-কোঁ যখন
রোদে-ঝিমোনো নিষ্প্রাণ
মফস্বল দুপুরের নিস্তব্ধতাকে
ছিন্নভিন্ন করে দেয়।
কিন্তু এ তো দেশলাইয়ের আলো।
অরুণোদয় হবে কবে তার জীবনে?
অন্ততঃ পূর্ণচন্দ্রের আবির্ভাব।

এমন সময় আলাপ হল
শশিশেখর সেনের সাথে।
স্কুলের সেক্রেটারীর ভাইপো
শশিশেখর,
কাকার বাড়ী এসেছে
পনেরই আগষ্টের
ব্রত উদ্‌যাপন করতে।
একেবারে সাধারণ মানুষ;
না রোগা, না মোটা;
না লম্বা, না বেঁটে;
না ফর্সা, না কালো;
চোখে নেই অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতা,
নাক নয় গড়ুর পাখীর চঞ্চুর মত,
পাতলা চাপা ঠোঁটও নেই দৃঢ়তাব্যঞ্জক,
এমন কি চুলটাও নয় কোঁকড়ানো;
কিন্তু সব মিলিয়ে
কী যেন একটা আছে;
আর আছে
কথা বলার একটা বিশেষ ভঙ্গী।
অত্যন্ত সাধারণ কথা বলে শশিশেখর;

কিন্তু বলে যখন,
মনে হয়
প্রেম করেছে যেন।
(শোনা যায়
ওর পাশে মাঠে দাঁড়িয়ে
ফুটবল-ম্যাচ দেখেছে যারা,
দু বছর পরে
ট্রামে দেখা হ'লে
তারাও
নমস্কার করে ওর কুশল শুধিয়েছে।
হলপ করে বলতে পারব না,
তবে নানা জনের মুখেই
এ কথা শুনেছি)।
শশিশেখর ছিল ওখানে ছদিন।
প্রমীলা বলে—
ও কদিন
ঘড়ির ছোট কাঁটাটা
বড় কাঁটার অংশ গ্রহণ করেছিল।

পূজোর ছুটীতে
কলকাতায় এল প্রমীলা ;
চিঠি পাঠালো শশিশেখরের ঠিকানায়;
লিখলো—
সাধ ছিল
পদ্মাপারের রান্না খাওয়াব আপনাকে ;
হয়ে ওঠে নি ওখানে।
তেরই অক্টোবর
এগারটার সময়
আসবেন কি আমাদের বাড়ীতে ?

খাবার পরে দুপুর বেলা
হাতে অজস্র সময় রয়েছে ;
বাইরে যাবার ইচ্ছে রইল ।
ভালো কথা, বলতে ভুলে গেছি—
ওটা আমার জন্মদিন ।

এসেছিল শশিশেখর ।

পূজোর ছুটিটা মন্দ কাটে নি প্রমীলার ।

তারপরের দুটো ছুটিতে
দেখা হোলো না শশিশেখরের সাথে ।
বড়দিনের সময় শোনা গেল
তিনি নাকি নাগপুরে—
কলকাতায় কমলালেবুর বাজার
সেবার শীতেও বেশ গরম ।
গরমের সময় তিনি সিকিমে—
ভুটানীদের নিয়ে
বই লেখা হবে একটা ।

(সংযোগ ছিল চিঠিপত্রে) ।

দেখা হোলো
আবার পূজোর সময় ।
প্রমীলা তখন 'উৎক্ষিপ্ত' ।
নানারকম অনুযোগ শুনতে হয় শশিশেখরের ।
"জানো, কতলোকের মুখটেপা হাসি
সহ্য করতে হয় আমাকে ?

শুনেছ,
দিদি বৌদি কি বলে আমাকে ?
ওরা বলে—
রাধার হোল কি ?
চোখে নেই ঘুম,
মুখে নেই ভাত,
হ্যালা, তোর হোলো কি লো ?"
কি বলবে শশিশেখর ?
চুপ করে শোনে শুধু।
(প্রেম করা বন্ধ)।
একদিন আর থাকতে পারল না প্রমীলা।
বলল—
আমায় বিয়ে করবে কিনা বল
তোমায় না হলে বাঁচব না আমি।
আঁৎকে উঠলো শশিশেখর,
প্রস্তুত ছিল না এতখানির জন্য !
ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল
প্রমীলার মাথায়,
ওর ফোঁপানী থামল যখন,
বলল আস্তে আস্তে—
বুঝছি তো সবই প্রমীলা
কিন্তু পৃথিবী যে বড় ছোট।
পৃথিবী সত্যিই বড় ছোট।
প্রমীলার বিয়ে হল
প্রতুল বাঁড়ুয্যের সঙ্গে—
শশিশেখরের বন্ধু ও প্রতিবেশী প্রতুল
যার সঙ্গে
প্রমীলার আলাপ হয়েছিল দু এক দি-

ওরই বাড়ীতে,
মহাধিকরণের
উঁচু দিকের কেরাণী প্রতুল
পনের বছর পরে
রিটায়ায় করার সময়
যার পেনশনের অঙ্ক সাড়ে চারশোর কম
হবে না কিছুতেই।

*　　*　　*

শুনেছি—
শশিশেখর আছে এখন জান্‌জিবারে;
ভারতবর্ষে লবঙ্গ পাঠায়
জাহাজ জাহাজ,
আর গল্‌ফ খেলে;
উড়োজাহাজে করে স্কচ আনায়
খাস স্কটল্যাণ্ড থেকে;
দিশী জিনিষ না কি তেমন জোরালো নয়!

স্পর্শনী

হে বৃত্ত আমার,
মর্মে পশিবার মোর নাহি অধিকার।
তোমার সীমান্ত শুধু ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাই,
ক্ষণস্পর্শ তবুও তো পাই।
বাঁকাপথে ঘুরে তুমি মর বার বার,
আমার সরল পথ সুদূরবিস্তার;
ক্ষণিকের ছোঁওয়া লাগে—জাগে শিহরণ,
মুহূর্তে মিলায় সেই ক্ষণ
হে বৃত্ত আমার,
আমি শুধু স্পর্শনী তোমার।

---

* স্পর্শনী Tangent স্পর্শক শব্দটি আমাদের ভাল লাগে না।

যাত্রা শেষ

ভয়হীন নিষ্পলক চোখে
যে মূর্ত্তি দেখিনু তব,
যে ঝড়ের আসন্ন আভাস
মর্ম্মমাঝে ছিল কম্পমান,
যে বিদ্যুৎ জলভরা মেঘে
সংঘর্ষের আগ্রহে উদ্যত,
যে মরণ শান্ত উষাপারে
স্থির ছিল স্তব্ধ অপেক্ষায়,
উৎকণ্ঠিত মনের যে বাণী
নৈঃশব্দের মাঝে অচঞ্চল,
কুণ্ঠাহীন যে প্রদীপ্ত আশা
সন্ধ্যাকাশে নক্ষত্রের মত
রঙে রঙে হয়নি বিলীন—
তারা সবই স্বপ্ন আজি ?
বেশ, যদি তাই হয়,
তবে, তাই হোক্।

মানুষের তীর্থযাত্রা
বার বার গেছে থেমে ;
ক্ষুদ্র বাধা,
সংশয়ের ক্ষুদ্র এক কণা
ব্যাহত করেছে গতি।
বারে বারে
রৌদ্রজ্বলা বিসর্পিত পথ
রুক্ষতায় হয়েছে বন্ধুর।

শ্যামল কানন পথপার্শ্বে
সারাক্ষণ করেছে আহ্বান—
সান্ত্বনার ছলনা তাহার,
আপদের মৃত্যুপথ হতে
টেনে রাখিবার সুস্নিগ্ধ কোমল আমন্ত্রণ—
তারও শেষ হোলো ?
বেশ, তাই যদি হয়,
তবে, তাই হোক্।

মানুষের সাধনার,
মানুষের বেদনার
যে দ্যুতি জ্বলিছে যাত্রাশেষে,
যাহার উদ্দেশে প্রভাতেতে হয়েছি বাহির,
সে যে আজও ঠিক ততদূরে।
সে কি সত্য ?
সে কি মরীচিকা ?
অদৃশ্য লিপির লেখা
বিস্তীর্ণায়মান এই কালের পাতাতে ?
সে কি অনির্ব্বাণ আলেয়ার আলো—
নিভে যাবে একদিন দুর্য্যোগের মাঝে
ব্যর্থ করি দুঃখযাত্রা ?······
শ্যামল কোমল কাননের
বিড়ম্বিত আমন্ত্রণ-স্মৃতি
একবার উঠিবে শিহরি'
কোকিলের তীক্ষ্ণ কুহুস্বরে।
তারপরে
স্থির হয়ে যাবে সব।
চলন্ত কল্যাণ সব ঢেকে দেবে ;
মানুষের তীর্থযাত্রা না থামে কখনও।

—দুঃখের তিমিরে যদি জ্বলে
তব মঙ্গল আলোক······

যথাভিরুচি

আমার কথা ভাবছে যারা
অসম্ভবের রঙে রঙীন সাগর তীরে
বাসা তাদের।
আশা তাদের
ইন্দ্রধনুর ঝালর দেওয়া—
ধুলোজলের সূর্য্যালোকের খেলাতে যার
জন্ম হোলো।
হায়রে আশা, হায়রে রঙ!
বিদায় বেলার পূরবী যে
উদয়কালের ভৈরবীতে জড়িয়ে আছে:

—পূর্ব্বাচলের পানে তাকাই···

বজ্রানলের স্বপ্ন দেখছ কেন
ঝরাজলের লিখছ ইতিহাস?
অন্ধকারে ভয় পেয়েছ বুঝি,
ঝড় ঝাপটে লাগছে বুঝি ত্রাস?
ওরা তো সব ছায়ার দৈত্য শুধু
আস্ফালনের পরেই বিদায় নেবে,
এইটুকুতে ভয় পেয়ে কি তুমি
মনুষ্যত্বে জলাঞ্জলি দেবে?

—বিপদে মোরে রক্ষা কর
এ নহে মোর প্রার্থনা·

আশ্চর্য্য এ জগতের তীক্ষ্ণ হানাহানি,
আশ্চর্য্য এ অনর্থক তীব্র অস্ত্রাঘাত,
আশ্চর্য্য এ বিষবাষ্প করিয়া সৃজন
মানুষের রুদ্ধ করা শ্বাস।
আশ্চর্য্য এ অকারণ অভাব-বিলাস,
আশ্চর্য্য এ একমুষ্টি অন্নের লুণ্ঠন,
আশ্চর্য্য এ অভাবিত ভ্রাতৃরক্তপাত,
পথ নিয়ে এই টানাটানি!

—যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে

কবিতার শেষ

ওগো এলোকেশী—
দেবার আগে,
নিজের ভাগে
ফেলেছি নিয়ে বেশী।
হায়,
অতি লোভ,
ক্ষোভ তাই,
যাই
চাই বিদায়।
হায়রে হায়
হায়রে হায়।
কোরো নাক খেদ।
আজি হোক চির স্থির
সমাপ্তির
শেষ পূর্ণচ্ছেদ।
ঋণ
বাড়ে প্রতিদিন।
তোমার
ক্ষতি
অতি।
লাভ আমার।
হায়,
হিসাব দিতে
হিসাব নিতে
মন যে নাহি চায়
তাই,
যাই,
চাই বিদায়।
হায় রে হায়,
হায় রে হায়।
কোরো নাক শোক।
তবে তাই হোক,
তবে তাই হোক,
তবে তাই হোক।

অত্যাধুনিক—নং১

ধ্বান্তের অবসান কান্তের স্পর্শ—
শান্ত বেদান্তের হর্ষ ;
ঈশানের বিষাণের, কৃষাণের বাঁশীতে
শ্মশানের, মশানের হাসিতে
লাগালো যে ভ্রান্তি
আজ রাতে হোক্ তার শান্তি।

—নিশীথ রাতের বাদল ধারা······

অত্যাধুনিক—নং ২

অতন্দ্রিত বুভুক্ষার আনীল বাসনা
মর্ম্মরিয়া, নিঃশ্বসিয়া উঠে; স্বর্ণিল গোধূলি
কালকূটে ভরা। শ্যামলের আবাহন
ক্রন্দসীর চন্দ্রাতপতলে। সন্দেহ ধূসর
ধরণীর গ্রামীণ অঞ্চল বিক্ষোভে গৈরিক
আজি; পাপকৃষ্ণা রুদ্ধা নগরীর
শুভ্র সতীত্বের মোহ রক্তে রক্তে লাল হোল

—হে নূতন দেখা দিক আর বার···।

•

অত্যাধুনিক—নং৩

রাঙা মেয়ে নিয়ে ভাঙা স্বপনের ছবি
বিছানায় শুয়ে বেদনা মুহ্যমান।
রক্তের স্রোত ফেটে পড়ে আজ
কোন্ সে উৎস হতে,
আগামী দিনের রক্তিম ইঙ্গিত ?
ভীরু গোলাপের পূর্ণ স্বপন সাধ ?
তাই কি আজিকে বহিরাগতের সলাজ আমন্ত্রণ
শয়নকক্ষে তার ?
আজি কি মুক্ত নিভৃত বক্ষদ্বার,
বিহ্বল রাতে রক্ত আলিম্পনে ?

—যৌবন নিকুঞ্জে গাহে পাখী……

অস্কার ওয়াইল্ডের বুলবুল পাখী ও গোলাপ ফুলের গল্পটী পড়িয়া দেখিতে পারেন।

অত্যাধুনিক---নং৪

ম্লান অন্ধকার,
চাঁদ ক্ষয়ে যাচ্ছে
মিলে যাচ্ছে,
মিশে যাচ্ছে,
ঊষাপাণ্ডুর আকাশের পূর্ব সীমানায়!
কমরেড, তোমার সঙ্গীন কোথায়?
লাল ঝাণ্ডা উঁচু কর;
ফেরাও মুখ,
চল এগিয়ে—
পশ্চিম যে এখনও অন্ধকার।
জঙ্গী পায়ের
দৃপ্ত আঘাতে
ফেটে ফেটে পড়ুক
লোলুপ পৃথিবীর কৃপণ কঠিনতা;
অভিবাদন কর
নতুন দিনের অবির্ভাবকে;
জয় ধ্বনি দাও
আগামীর।
বল—
সূর্যোদয়ের জয়,
স্তালিনগ্রাদের সূর্যোদয়ের জয়,
রক্তস্নাত, হত্যাশুভ্র, স্তালিনগ্রাদের জয়!

-আমি যে দেখেছি প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে···

এ যুগের চাঁদ (২)

বলি কাণে কাণে আস্তে
এ যুগের চাঁদ কাস্তে,
পূর্ণিমা চাঁদ
মিছে পাতা ফাঁদ
মিছে ডাকা ভালবাসতে
আমরা উপোষী ;
তবুও রূপসী,
লজ্জা করে না হাসতে ?
এই কলি যুগে
রোগে ভুগে ভুগে
মরছি কাসতে কাসতে।
লজ্জা করে না হাসতে ?
ওগো ভরা চাঁদ;
ঘোর পরমাদ
চেওনাকো কাছে আসতে।
কেন মিছে সাধ
মিছে পাতা ফাঁদ
মিছে ডাকা, ভালবাসাতে ?
ওগো চাঁদ, তুমি কাস্তে।

এ যুগের চাঁদ যে কাস্তে বাংলা দেশে তাহা আবিষ্কারের কৃতিত্ব কবি দীনেশ দাসের।

পরিশিষ্ট

সবই গোলমালে ব্যাপার আমাদের। শেষ ফর্ম্মা যখন ছাপা হচ্ছে তখনও কবিতা দেওয়া হল। পনের দিনে ছাপিয়ে বার করা বই কিনা!...প্রুফ দেখার কাজ আমরা জানিনা। পরের ওপর নির্ভর করেছি। তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ বটে; তবে ছাপায় যে সব ভুল রয়ে গেছে তাতে কাঁদতে ইচ্ছে করছে দুজনেরই। নিতান্ত খারাপ দেখায় বলে কাঁদতে পারছি না শুধু। যতগুলো ভুল পারলুম হাতেই ঠিক করে দিচ্ছি। শুদ্ধিপত্র দেবারও সময় নেই।

অ, রা